ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুত্তীর্ণ' : নস্টালজিক আবহ ও শিল্পশৈলী

রাজিব মণ্ডল*

সারসংক্ষেপ: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চল্লিশের কবি; মূলত প্রগতিশীল চিন্তামুখী ও সমাজসচেতন এই কবি পরাধীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্ব-ঐতিহ্য অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথম কাব্য *গ্রহচ্যুত* দিয়েই সমসাময়িক কাব্যজগতে আলোড়ন তোলেন। *মৃত্যুত্তীর্ণ* তার অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। নস্টালজিক চেতনা তার কবিতায় বিশেষ প্রভাব রেখেছে এবং প্রায় প্রতিটি কাব্যেই কবিতার আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে *মৃত্যুত্তীর্ণ* কাব্যের এই দুটি দিককেই আলোকপাত করা হয়েছে।

সময়োচিত ভাবনা-বিষয়বোধ ও অভিজ্ঞতা মানুষকে নতুনভাবে বাঁচতে শেখায়, যদিও পরিবেশ ও প্রতিবেশ স্মৃতি রোমন্থনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবহমান কাল থেকেই বাঙালি জাতি হিসেবে অনেক বেশি আবেগ-প্রবণ; ফলে স্মৃতি রোমন্থনের বিষয়টি বাঙালির মজ্জাগত। যদিও বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কখনোই স্বাভাবিক থাকে নি। বলা যায়, বাঙালির ইতিহাস ঔপনিবেশিক ইতিহাস, সময়ের পালাবদলে বহিঃশক্তির আগমন ও আগ্রাসন দুটোই দেখেছে বাঙালি সমাজ। কাব্যকথাতেই সাহিত্যের বহমানতা এবং কাব্যে নস্টালজিক ভাবনার প্রভাব অত্যন্ত সুপ্রাচীন। কালিদাসের *মেঘদূত* স্মৃতিকাতর যক্ষের হৃদয় নস্টালজিয়ার মধ্যে খুঁজে ফেরে আত্মতৃপ্তি। কাব্যে সচেতনভাবে নস্টালজিক ভাবনার উন্মেষ ঘটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩খ্রি.) হাত ধরে, 'মধুকবির বাংলা ভাষার সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপটই নস্টালজিক চেতনা। স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষা প্রীতি তাঁর হৃদয় গহীনে থাকা নস্টালজিক চেতনারই বিস্ফোরণ।'[১]

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
... ...
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।[২]

কিংবা

* রাজিব মন্ডল, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন- লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি-
... ...
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মনিজালে।[৩]

এছাড়া মাইকেল মধূসূদন দত্তের সমগ্র সাহিত্যে স্বকাল স্বদেশ ও স্বজাতভাবনার প্রেক্ষাপটের মূলে নস্টালজিক চেতনার ভূমিকাই প্রধান। তাঁর অমর সৃষ্টি *মেঘনাদবধ কাব্যের* (১৮৬১) কাহিনির উপাদান তিনি নিয়েছেন *রামায়ণ* থেকে, যা তাঁর নস্টালজিক চেতনার ফসল হিসেবে চিহ্নিত। বাংলা কবিতায় আধুনিকতা প্রকাশে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ, শিল্প-বিপ্লবের প্রসার,নাগরিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যস্ততা, হতাশা-বিকার ও পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের প্রভাব অসামান্য এবং তা মাইকেল মদুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৩১) কিংবা ত্রিশের জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে চল্লিশের একদল প্রতিভাবান কবি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। অরুণ মিত্র (১৯০২-২০০০), দিনেশ দাস (১৯১৩-১৯৮৫), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-২০০২), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) প্রমূখ সাম্যবাদেই জাতির মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন তাঁদের কাব্যচর্চায়। তাঁরা মনে করতেন– 'শ্রেণী বিভক্ত সমাজ চেতনাকে পোষ মানানোর যা আছে তাকে স্বীকার করে নেবার একটি মোক্ষম উপায় ভাষা।'[৪]

২.

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি কবি।'[৫] কবি মানসের একান্ত সৌন্দর্যভাবনা নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমৃত্যু বেঁচেছেন, দীর্ঘদীন লিখেছেন, সময় ও মানুষকে এঁকেবছেন কলমের ছোঁয়ায়। ১৯৪২-১৯৮৫ সুদীর্ঘ ৪৩ বছর কাব্যচর্চায় নানা বৈচিত্র এনেছেন কাব্যে-কবিতায়। *রানুর জন্য* (১৯৫১), *উলুখড়ের কবিতা* (১৯৫৪), *লখিন্দর* (১৯৫৬), *তিন পাহাড়ের স্বপ্ন* (১৯৬৪০), *ভিসা অফিসের সামনে* (১৯৬৭), *মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়* (১৯৭২) প্রভৃতি কাব্যে বিষয়ের বৈচিত্র্যময়তা ও আত্মোপলব্ধির সমন্বয়ে উপস্থাপিত জীবনবোধ প্রকাশিত। অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কথা বলে গেছেন আমৃত্যু। প্রথম

কাব্য *গ্রহচ্যুত* (১৯৪২) হলেও *নতুন মাস* (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) কাব্যে প্রথম রাজনীতিতে আস্থা রাখেন তিনি। মৃত্যুত্তীর্ণ (১৯৫৫) কাব্যে যদিও রাজনৈতিক ভাষ্য নেই, দেবার চেষ্টাও বোধহয় তিনি করেন নি; মাত্র ১৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে; যদিও প্রথম সংকলনে ১৮টি কবিতা ছিল এবং কোন সূচিপত্র ছিল না। ক্ষুদ্র এই কাব্যের কবিতাগুলো কবির আত্মপোলব্ধির স্মারক হিসেবে পাঠক হৃদয়ে অনুরণন ঘটায় এবং এই আত্মপোলব্ধির পেছনে তাঁর ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রীতি নস্টালজিক চেতনায় প্রকাশিত। কাব্যের প্রথম কবিতাতেই নাটকীয়তাপূর্ণ উপমা বহুল শূভচেতনার মধ্য দিয়ে জীবনবোধের নতুন দিক উন্মোচন করেছেন; শুভ চেতনার প্রতীক ঝাউবন মাতৃরূপ নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে এবং বাতাসের মধ্য দিয়ে ঝাউবন তার অপত্যকে ডাকছে অপার স্নেহে–

ক্রান্তিলগ্ন কেঁপে গেল রাত্রির গর্ভের অন্ধকারে
থরো থরো। চেতনার চারণ সংগীত শিহরণে
একবার জন্ম নিয়ে তারপর আলোর পাহাড়ে
গতি তার মিশে গেল।[৬]

সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে; প্রয়োজন মানুষকে কাছে আনে, আবার দূরে ছেড়ে দেয়, এই অমোঘ বাস্তবতা কবিকে একাকী করে তোলে–

তবু সে ভাস্বর চিত্তোপ্রতিমার রঙের বিস্ময়ে
দেখি তাকে অপরূপ প্রীতি সখ্য শপথ আশ্রয়[৭]

ইতিহাস ও ঐতিহ্যবোধ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিমানসে বারবার ফিরে এসেছে এবং এই প্রেরণার উৎস হিসেবে তাঁর নস্টালজিক ভাবনাই প্রধান হিসেবে কাজ করেছে; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯০) সমাজ সংস্কার আন্দোলন উপমহাদেশীয় জীবনবোধে যে ভূকম্পন তুলেছিল তা ছিল সময়ের দাবী এবং এ কারণেই বিদ্যাসাগর স্মরণীয়-বরণীয়-মৃত্যুত্তীর্ণ–

রাত্রির অস্বস্তি ছিড়ে প্রভাতের জন্মের সংগীত
এনেছিলে নচিকেতা ! নিস্তব্ধের অচলায়তনে
তোমার জিজ্ঞাসা যেন ভূকম্পন !
... ...
জীবনের ঘাটে মাথা খোঁড়ে তোমার প্রার্থনা
মৃত্যুত্তীর্ণ হৃদয়ের হাটে মাঠে বস্তিতে বন্দরে
পরিশুদ্ধ প্রেমিকের মহাকাব্য করেছে রচনা,
শতাব্দীর ভগীরথ ! আসমুদ্র চেতনার ঝড়ে।[৮]

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলাদেশের বিক্রমপুরে; মাইকেল মদুসূদন দত্তও স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে তিনি স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধাভরে; মাইকেলের সমাধি ফলককে

কবিতায় দেখিয়েছেন নগর জীবনের ক্লান্তি ও স্খলনকে এবং উপস্থাপন ভঙ্গিতে এনেছেন সুনিপুণ বাঙ্ময়তা–

দাঁড়াও পথিকবর ! বিবর্ণ বিকেলে
এখন আফিস ছুটি ! হৃদয়ের গান
তথাপি বিষণ্ন ! তুমি ক্লান্ত হেঁটে এল
সারকুলার... পার্ক স্ট্রিট... রাত্রির কামান।[৯]

পরাধীন ভারতবর্ষকে সেই মহাসংগীতের কথা কবি মনে করিয়ে দিতে চান; যে মহাসংগীতের প্রেরণায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছেন *মেঘনাদবধ কাব্য*; বিনির্মাণ করেছেন স্বদেশপ্রেমী মেঘনাদ-রাবণকে। আজ সমগ্র ভারতবাসী সেই মহাসংগীত সুধা পান করে উজ্জীবিত হতে পারে স্বাধীনতা অর্জনের পথে; স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণের উপাদান আরোহণে তিনি ফিরেছেন অতীতে, যা নস্টালজিয়ারই অপর পীঠ–

অন্য-এক চেতনায় ! কান পেতে শোনো
সে মহাসংগীত ! দেখো , গৌড়জন যাতে
আনন্দ করবে পান , সে সুধা এখনো
তোমার সম্মুখে স্থির ! ...যন্ত্রণার রাতে
কথা রাখো, চেও নাকো দুঃস্বপ্নে ঘুমাতে
তার চেয়ে তাঁর মুখ দেখো তাঁকে চেনা।[১০]

স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলি সনেট হলেও এর গীতিময়তা স্মৃতিকাতরতায় হৃদয়কে আর্দ্র করে তোলে–

সতত তোমার আর্তি আমার রাত্রির ঘুম থেকে
তৃপ্তির আলস্য নিয়ে খেলা করে; নিশির যন্ত্রণা
একতারার মতো বাজে; শ্রান্তিহীন রক্তের অসুখে
বিবর্ণ সান্নিধ্য আনে অস্বস্তির আমৃত্যু সান্ত্বনা।[১১]

চল্লিশের দশকে উত্তাল কলকাতা, সময়কে গ্রাস করে এছ দুঃসময়, পারিপার্শ্বতাকে গ্রাস করে আছে অন্যায়-অবিচার; এই দুঃসময়ে এতটাই অস্থিরতায় সমৃদ্ধ যে বিপ্রতীপ একটি তৈলচিত্র মনে হয়, এক; গ্রহণ মূলত বিবর্ণ সময়ের কবিতা–

যন্ত্রণার শেষ নেই; সূর্যাস্তে কি সূর্যোদয়ে মনে
স্বর্ণসীতা ! বুকে যত নেই নেই কান্নার সমুদ্র
রক্তাক্ত স্মৃতিতে মাথা কোটে, ফাঁকি ততই গর্জায়
শীত কি বসন্তে; কিংবা কৈলাসেও কালবৈশাখী রুদ্র
তুষার আগুন ছোঁড়ে ! আলো নেই, দগ্ধ দ্বিপ্রহর !
শ্রাবণে অশান্ত কান্না; ভাদ্রে নষ্টচন্দ্র, কাশজ্বর ![১২]

মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বর্বরতাকে লালন করে চলেছে; কিন্তু বলা হচ্ছে মানুষ সভ্যতার বিবর্তনে সভ্য; কিন্তু এই সভ্যতার আড়ালে বর্বরতার নগ্নরূপ লুকিয়ে আছে। দেবেশ রায়ের *তিস্তা পারের বৃতান্ত* উপন্যাসে চিত্রনায়িকা শ্রীদেবীর অর্ধনগ্ন নৃত্য যেন সভ্যতার বর্বরতাকে মনে করিয়ে দেয়; বাঘারুরা তো প্রকৃতির সন্তান। উচ্চবিত্তরাই পানশালায় বসে বিলাসী কল্পনায় মত্ত থাকে। উচ্চবিত্তের ভোগলিপ্সু মানসিকতার পরিচয় ঘুড়িতে পাওয়া যায় স্পষ্টভাবে–

> বিবর্ণ রৌদ্রের মৃতদেহ নিয়ে কয়েকটি যুবা
> টেবিলটেনিস খেলে অপরাহ্নে এখন ক্লান্তিতে
> মাদ্রাজি পানশালার পেতলের চকচকে গেলাসে
> ধীরে ধীরে চুমু খায়, দাঁত বসায় সন্ধ্যার সিগারে।
> দিনের প্রর্থনা শেষ। তা বলে এখুনি যুবকেরা
> ঘুমাবে না; গর্ভবতী হরিণীর মতো পূর্ণিমাকে
> নখে নখে ছিঁড়ে দিয়ে ফ্লাসবোর্ডে তাসের মতন
> ছড়াতে তাদের সাধ; মাংস কিংবা পয়সায়
> টুংটাং।[১৩]

সভ্যতার বিবর্তনে মানুষের পশুর মত নখ নেই; নেই হিংস্র রূপ; কিন্তু মানুষ তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে নি। পোশাকের আড়ালে যেন সে নখ ঢেকে রাখে, লোভ-হিংসার জান্তবতাকে নিজের অজান্তে লালন করে চলে। উচ্চবিত্ত বরাবরই মাটিবিছিন্ন; উচ্চবিত্ত যুবক ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উচ্ছৃঙ্খল; উচ্ছৃঙ্খল এইসব যুবকের কাছে দেশ জাতি কোন কিছু আশা করতে পারে না। বিলাসী জীবন ছেড়ে কবি সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে বলেছেন এইসব তরুনদের, উদ্বুদ্ধ হতে বলেছেন স্বদেশপ্রেমে–

> সেই সব টুকরো সাধ জোড়া দিয়ে রাত্রির আঠায়
> বিশ্বকর্মার চেয়ে অধিক উৎসাহ বুকে নিয়ে
> মহামান্য যুবকেরা-ডক্টর, শ্রীযুক্ত, কমরেড-
> শিল্প রুচি, প্রগতির দায়িত্বে সৃষ্টির কর্মে মাতে।[১৪]

যুবক তরুণদের প্রতি বীরেন্দ্রের এই আহবান নিছক নয়; লাল পতাকার তলে এসে লাল সূর্যকে উড়িয়ে দেবে তারা। উচ্চবিত্ত এইসব তরুণ তাদের প্রগতি ও শিল্পে যা মাটি বিছিন্ন, মানুষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিত্যাগ করে জীবনের প্রয়োজনে যে দর্শন তাকে গ্রহণ করবে এবং উড়াবে বিজয়ের ঘুড়ি–

> সেই সৃষ্টি-ব্যবহৃত ঠোঙা আর দৈনিক কাগজ-
> আমাদের সূর্য; এসো, আকাশে উড়িয়ে দেওয়া যাক।[১৫]

এই সংঘবোধের বাণী পরোক্ষভাবে তা নস্টালজিক আবহ যা এই তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে সমাজ সজেতন হতে এবং এর ফলাফল স্বাধীন স্বদেশভাবনা; অর্থাৎ যার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসবে।

৩.

সচেতনভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তই মনে হয় প্রথম নস্টালজিয়াকে মিথের সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মিথের বিনির্মাণ করে নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন; কিন্তু আমার মনে হয় মিথের সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬); ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যীয় মিথের সাবলীল সমন্বয় করার সহজাত প্রতিভা নজরুলের মধ্যে ছিল; এবং তিনি তা করে দেখিয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডব তথা বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সবাই কম বেশি মিথের ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নগর জীবনের হতাশা ক্লান্তি ক্ষোভকে উপস্থাপনের লক্ষ্যে মিথের সমন্বিত ব্যবহার করেছেন সম্ভবত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম। যেমন রামের সীতা উদ্ধার উচ্চবিত্তের বিলাসিতা, নিম্নবিত্তের জীবনযুদ্ধে এই বিলাসিতা নেই; মৌলিক চাহিদা যোগাতেই নিম্নবিত্তের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই সীতা উদ্ধারে কবির নিস্পৃহতা কবিতায় উঠে এসেছে–

> একা রাম শূন্য রামায়ণ;
> প্রতীক্ষা-অতিষ্ঠ সতী ব্রত ভাঙে। বিবর্ণ, অলস
> বিকেল হটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা আসে ক্রিমির বিক্রমে;
> সমস্ত শরীর নেয়; সংকীর্তন থেমে যায় সমে।
> সমুদ্র লঙ্ঘনে কোন কাজ? আশা নির্জনে লজ্জায়
> শয্যাশায়ী; হাসপাতালে উন্মাদেরা রামায়ণ গায়।[১৬]

বেহুলা-লখিন্দরের লোকজ মিথকেও তিনি নতুন মাত্রা দিয়েছেন–

> তুই তথাপি বেহুশ নটিনী ?
> চার দেয়ালের বীক্ষণে
> নখী নক্তচরীর ভিড়ে কি
> ভয় লজ্জাও নেই মনে !
>
> একি যৌন-জ্বরের জলসায়
> তুই তনু দিলি অঞ্জলি
> হাসি কান্নায় চুনি-পান্নায়
> ছুড়ে দিলি ছেঁড়া কুণ্ডলী।

ওকি দেবতা-অসুর জড়সড়
বোবা রক্ত কোলাহলে
এই বেহুলা-নাচানো স্বর্গ?
সে-যে আগুনের মতো জ্বলে ![১৭]

এছাড়া নটরাজ মিথেও এনেছেন বৈচিত্র্য–

সে একা। স্বর্গের ইন্দ্রসভায় উর্বশী
কটাক্ষে বিধেঁ না তাকে। প্রজাপতি দক্ষ
তার নাম আনে না এক-মুখেও। প্রত্যক্ষ
সংগ্রামে কি অমৃতের বণ্টনে পড়শি
... ...
ছায় নামে-দক্ষযজ্ঞে, সমুদ্র মন্থনে-
তারই বার্তা দূরে বসে অন্নপূর্ণা শোনে।[১৮]

৪.

চল্লিশের কবিরা ছন্দ ও মিলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই দশক বামমনস্ক অনেক কবির প্রতিষ্ঠাকাল, কবিতাকে জনগণের গণজোয়ারে প্রবেশ করানোর কৃতিত্ব এই দশকের কবিদেরই; শ্লোগানের বিকল্প তা যেন শ্লোগানধর্মী, গণজাগরুক, মিছিলের সঙ্গী এমন কবিতা লিখে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন অনেকে। এছাড়াও তাঁদের কাব্যভাবনায় 'লোককবিতার প্রতি সেই সময়ে আগ্রহ জেগেছিলো নতুন করে। কবিতার সহজ ভাষা, সরল মিল ও সুরেলা ছন্দে আবার কিছুটা ফিরে গিয়েছিলেন তাঁরা। ত্রিশের কবিদের ভাবনা ও বাণী নির্মাণে অতি বৈদগ্ধের যে ঝোঁক ছিলো তা যথেষ্ঠ সমালোচিতও হয়েছিলো এইপর্বে।'[১৯] বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এঁদের ব্যতিক্রম নন, তবে স্বতন্ত্র; তিনি কবিতায় সাধারণ মিল ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে, কিন্তু *মৃত্যুত্তীর্ণ* এর প্রভাব অনেকটা ক্ষীণ। এই কাব্যের **১৩**টি কবিতার **১০**টিই সনেট, ফলে কাঠামোগত কারণে দেখা যায় 'মিলের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কারুকার্যময় 'সনেট' রূপবন্ধটির প্রতি বেশ আগ্রহ ছিলো তাঁর।'[২০] সনেট বিনির্মাণে তিনি প্রেত্রার্কীয়, শেক্সপীয়রীয়, ফরাসি কিংবা ইতালীয় সনেটের অন্ধ অনুকরণ করেন নি। বরং মাত্রা ব্যবহারে বৈচিত্র এনেছেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে। আবার সনেটের সামঞ্জস্য বা মিল রক্ষার তাগিদে কঠোর ছিলেন এমনটাও বলা যায় না; তিনি তা করেনও নি। যেমন *মৃত্যুত্তীর্ণ* কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলোতে নানারকম বিচিত্র মিল বিন্যাসেনর নমুণা লক্ষণীয়–

কখখক/গঘগঘ/ছছচ (অবনীন্দ্রনাথের জন্য)
কখকখ/খগখগ/ঘঙঘঙ/ঙঘ (মাইকেলের সমাধি)
কখকখ/গঘগঘ/ঙচঙচ/ঙচ (তোমার স্বপ্নের মাঠ)
কখগখকখ/গঘখঘখঘখ/গগ (একটি কবির জন্য)
কখখক/গঘঘগ/ঙচচঙ/ছছ (নটরাজ)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, 'মিল বিন্যাসের এই ধরনের জটিলতার মধ্যে যেতেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনীহা ছিলো না।'[২১]

মৃত্যুত্তীর্ণ গ্রন্থের "নতুন চীন" কবিতাটি কাহিনিধর্মী, বক্তব্য উপস্থাপনে, ইতিহাস চেতনা উন্মোচনে কবিতাটি স্বতন্ত্র; কেননা কবিতার কাহিনির পেছনেও কাহিনি থাকে–প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্ক্সবাদের আদর্শ নিয়ে মাও সে তুং চীনের রাজতন্ত্র উৎখাত করেন এবং কৃষি বিপ্লব ঘটান এবং চীনের নতুন দিনের সূচনা করেন। নতুন চীনের এই শিশুটি হতে পারে আগামী দিনের মাও সে তুং; আবেগধর্মী এই কবিতার ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল গদ্যে নির্মিত। নতুন চীনের অস্থিতিশীল পরিবেশে নতুননের আগমনী বার্তা, যা অপ্রত্যাশিত; কিন্তু নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের মধ্যেই এই নতুন সম্ভাবনার বেড়ে ওঠা। কবিতার মা এখানে নতুন চীনের প্রতিমূর্তি এবং সে স্বপ্ন দেখে ও আশায় বুক বাঁধে দিন বদলের নতুন সূর্য আনবে এই শিশু–

শিশু জন্ম নিল...
জন্ম নিল ঘুঁটে-কুড়ুনির ঘরে'
স্যাঁতসেতে মাটির বিছানায়
এই তো নয় আবির্ভাব, নয় কোনো প্রভাব-সূর্যের গান
সূর্যের আলো ঢুকতেই পায় না রক্ত আর কাদার মাখা
জননীর আঁতুরঘরে।[২২]

৫.

বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুপেক্ষণীয় একটি নাম। *মৃত্যুত্তীর্ণ* কাব্যে সনেটের মতো স্থাপত্যধর্মী কবিতাতে ভাষা ব্যবহারের সহজতা-সরলতায়, ছন্দ বিন্যাসের কৌশলতায়, মিথ বির্নিমাণে এবং বিষয় বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভাবনার স্বরূপ উন্মোচনে নস্টালজিক চেতনাকে ব্যবহার করার অসাধারণ ক্ষমতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই মানায়, কেননা তিনি মৃত্যুত্তীর্ণ

তথ্যসূত্র:

১ অর্জুন রামাই, "অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল কাব্যে নস্টালজিক আবহ", সপ্তসিন্ধু (শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী), *দৈনিক দেডসটিনি*, সম্পাদক: রফিকুল অনীক, প্রকাশকাল, ২৮ জুন, ২০০৮।

২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কপোতাক্ষ নদ, চতুদ্দর্শপদী কবিতাবলী, *মধুসূদন কাব্যসমগ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৫, পৃ. ৪৪২।

৩ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্গভাষা, চতুদ্দর্শপদী কবিতাবলী, *মধুসূদন কাব্যসমগ্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৫, পৃ. ৪২৪।

৪ মালিনী ভট্টাচার্য, "মিথের ব্যবহার ও মিথ সৃষ্টি", *কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ কমিটি প্রকাশিত স্মরণিকা*, ১৪ ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৭৭

৫ জীবনানন্দ দাশ, "কবিতার কথা" *জীবনানন্দ শ্রেষ্ঠ সংকলন*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা, পৃ. ৫৫৭

৬ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "চেতনা সময়", *মৃত্যুত্তীর্ণ, বীরেন্দ্র সমগ্র প্রথম খণ্ড*, সম্পাদক: পুলক চন্দ ও সব্যসাচী দেব, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৫১

৭ 'একটি কবিতার জন্য' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

৮ 'বিদ্যাসাগর' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

৯ 'মাইকেলের সমাধি' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

১০ 'মাইকেলের সমাধি' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

১১ 'তোমার স্বপ্নের মাঠ' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

১২ 'গ্রহণ', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

১৩ 'ঘুড়ি' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

১৪ 'ঘুড়ি' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

১৫ 'ঘুড়ি' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

১৬ 'গ্রহণ' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

১৭ 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

১৮ 'নটরাজ' *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

১৯ সুমিতা চক্রবর্তী, "কবিতার মিল : কবির ভাবনা" *কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণ কমিটি প্রকাশিত স্মরণিকা*, ১৪ ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৬৪

২০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮

২২ 'নতুন চীন', বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *মৃত্যুত্তীর্ণ, বীরেন্দ্র সমগ্র প্রথম খণ্ড*, সম্পাদক : পুলক চন্দ ও সব্যসাচী দেব, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ পৃ. ৫৭।

ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

প্রসঙ্গ 'তরঙ্গভঙ্গ': ওয়ালীউল্লাহর নাটকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় নাট্যধারার প্রভাব

নূপুর দত্ত*

সারসংক্ষেপ: বাংলা নাট্যসাহিত্যে পাশ্চাত্য নাট্যমতবাদ সম্পর্কে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবীদার। যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য প্রথাবিরোধী নাট্যরীতির মধ্যে সংকেত-প্রতীকবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, অস্তিত্ববাদ, নির্মাণবাদ, ফর্মালবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য এই নাট্যরীতিসমূহের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকে অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদ প্রভাবিত নাট্যরীতিসমূহের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তবে নাট্যরচনার পটভূমি হিসেবে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশজ প্রতিবেশ ও উপকরণকেই বেছে নিয়েছেন। এই রচনাটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর দ্বিতীয় নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ'-তে উল্লিখিত ইউরোপীয় নাট্যমতবাদসমূহের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে শুধু অস্তিত্ববাদের কেন্দ্রীয় বক্তব্যই নয়, এখানে সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিব্যক্তিবাদী ও অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটকটির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত নাট্যরীতিসমূহের প্রত্যক্ষ প্রভাব এর সন্ধান যে ক্ষেত্রগুলোতে পরিদৃশ্যমান সেগুলোকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে উপরিউক্ত মতবাদসমূহের পরোক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রগুলোকেও চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বলিষ্ঠ কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) কালজয়ী ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত। সমকালীন বাস্তবতার নির্মমতা, বীভৎসতা ও নৈরাশ্য থেকে উদ্ভূত হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাধারা বিপ্লবী ও ব্যতিক্রমী। এই ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা তাঁকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল কৃতীপুরুষে পরিণত করেছে। বাংলা উপন্যাসে, ছোটগল্পে এমনকি নাট্যজগতেও উন্মোচিত হয়েছে এক অজ্ঞাত সম্ভাবনাময় দিগন্ত। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে চেতনাপ্রবাহরীতি আর নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তা দ্বারা। পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তা ও আধুনিক নাট্যরীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ বাস্তবতার রূপায়ণের মাধ্যমে সমাজ সংগঠন ও মানব অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণাকে নাট্যরূপ দিয়েছেন, যা ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদ, অভিব্যক্তিবাদ ও অ্যাবসার্ডবাদের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা।